

ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ঈমান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

প্রশ্ন: (১) তাওহীদ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: তাওহীদ শব্দটি (وحد) ক্রিয়ামূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কোনো জিনিসকে একক হিসেবে নির্ধারণ করা। ‘না’ বাচক ও ‘হ্যাঁ’ বাচক উক্তি ব্যতীত এটির বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ একককৃত বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তু হতে কোনো বিধানকে অস্বীকার করে একককৃত বস্তুর জন্য তা সাব্যস্ত করা। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলব, “আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা’বুদ নেই” একথার সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতীত কোনো ব্যক্তির তাওহীদ পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করবে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল বস্তু হতে উলুহিয়াতকে (ইবাদাত) অস্বীকার করে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করবে। কারণ, শুধুমাত্র নাফী বা ‘না’ বাচক বাক্যের মাধ্যমে কোনো বস্তুকে গুণাগুণ থেকে মুক্ত করা হয়। আর শুধুমাত্র ‘হ্যাঁ’ বাচক বাক্যের মাধ্যমে কোনো বস্তুর জন্য কোনো বিধান সাব্যস্ত করলে সেই বিধানে অন্যের অংশ গ্রহণকে বাধা প্রদান করে না। যেমন, উদাহরণস্বরূপ যদি আপনি বলেন, “অমুক ব্যক্তি দাঁড়ানো”। এ বাক্যে আপনি তার জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে সাব্যস্ত করলেন। তবে আপনি তাকে দণ্ডায়মান গুণের মাধ্যমে একক হিসাবে সাব্যস্ত করলেন না। হতে পারে এ গুণের মাঝে অন্যরাও শরীক আছে। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির সাথে অন্যান্য ব্যক্তিগণও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আর যদি বল, “যায়েদ ব্যতীত আর কেউ দাঁড়ানো নেই” তবে আপনি দণ্ডায়মান হওয়াকে শুধুমাত্র যায়েদের সাথে সীমিত করে দিলেন। এ বাক্যে আপনি দণ্ডায়মানের মাধ্যমে যায়েদকে একক করে দিলেন এবং দাঁড়ানো গুণটিকে যায়েদ ব্যতীত অন্যের জন্য হওয়াকে অস্বীকার করলেন। এভাবেই তাওহীদের প্রকৃত রূপ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ নাফী (না বোধক) ও ইসবাত (হ্যাঁ বোধক) বাক্যের সমন্বয় ব্যতীত তাওহীদ কখনো প্রকৃত তাওহীদ হিসেবে গণ্য হবে না। মুসলিম বিদ্বানগণ তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন:

১. তাওহীদুর রুবুবীয়াহ

২. তাওহীদুল উলুহিয়াহ

৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে গবেষণা করে আলিমগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাওহীদ উপরোক্ত তিন প্রকারের মাঝে সীমিত।

প্রথমত: তাওহীদে রুবুবীয়ার বিস্তারিত পরিচয়

সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক হিসাবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে রুবুবীয়াহ।

১- সৃষ্টিতে আল্লাহর একত্ব: আল্লাহ একাই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَنَّى تُفَكُّونَ ﴿٣﴾ [فاطر: ৩]

“আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা আছে কী? যে তোমাদেরকে আকাশ ও জমিন হতে জীবিকা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ৩]

কাফিরদের অন্তসার শূন্য মা'বুদদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[أَفَمَنْ يَخَذُلُكُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ ١٧] [النحل: ১৭]

“সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মতো, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১৭]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কর্ম এবং মাখলুকাতের কর্ম সবই আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের কর্মসমূহও সৃষ্টি করেছেন- একথার ওপর ঈমান আনলেই তাকদীরের ওপর ঈমান আনা পূর্ণতা লাভ করবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

[وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝ ৯৬] [الصافات: ৯৬]

“আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মসমূহকেও সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আস-সাফাফাত, আয়াত: ৯৬]

মানুষের কাজসমূহ মানুষের গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। কোনো জিনিসের স্রষ্টা উক্ত জিনিসের গুণাবলীরও স্রষ্টা।

যদি বলা হয় আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রেও তো সৃষ্টি কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

[فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحَدُ سَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ১৪] [المؤمنون: ১৪]

“আল্লাহ সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে উত্তম সৃষ্টিকর্তা।” [সূরা আল-মুমিনুন আয়াত: ১৪]

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন ছবি অংকনকারীদেরকে বলা হবে, তোমরা দুনিয়াতে যা সৃষ্টি করেছিলে, তাতে রুহের সঞ্চয় কর”।[১]

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহর মতো করে কোনো মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম। মানুষের পক্ষে কোনো অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। কোনো মৃত প্রাণীকেও জীবন দান করা সম্ভব নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের তৈরি করার অর্থ হলো, নিছক পরিবর্তন করা এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা মাত্র। মূলতঃ তা আল্লাহরই সৃষ্টি। ফটোগ্রাফার যখন কোনো বস্তুর ছবি তুলে, তখন সে সেটাকে সৃষ্টি করে না; বরং বস্তুটিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করে মাত্র। যেমন, মানুষ মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করে এবং অন্যান্য জীব-জন্তু বানায়। সাদা কাগজকে রঙ্গীন কাগজে পরিণত করে। এখানে মূল বস্তু তথা কালি, রং ও সাদা কাগজ সবই তো আল্লাহর সৃষ্টি। এখানেই আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

২- রাজত্বে আল্লাহর একত্ব:

মহান রাজাধিরাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। বলেন,

[تَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ১] [الملك: ১]

“সেই মহান সত্ত্বা অতীব বরকতময়, যার হাতে রয়েছে সকল রাজত্ব। আর তিনি প্রতিটি বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১]

আল্লাহ আরো বলেন,

[قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ۖ] [المؤمنون: ৮৮]

“হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার ওপর কোনো আশ্রয় দাতা নেই।” [সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ৮৮]

সুতরাং সর্ব সাধারণের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। কাউকে বাদশাহ বলা হলে তা সীমিত অর্থে বুঝতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা অন্যের জন্যেও রাজত্ব ও কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করেছেন। তবে তা সীমিত অর্থে। যেমন, তিনি বলেন,

[أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مِّفَاتِحُهُ ۖ] [النور: ৬১]

“অথবা তোমরা যার চাবি-কাঠির (নিয়ন্ত্রণের) মালিক হয়েছে।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬১]

আল্লাহ আরো বলেন,

[إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ۖ أَوْ مَا مَلَكَتْهُمُ أَيْمَانُهُمْ ۖ] [المؤمنون: ৬]

“তবে তোমাদের স্ত্রীগণ অথবা তোমাদের আয়ত্বধীন দাসীগণ ব্যতীত।” [সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ৬]

আরো অনেক দলীলের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরও রাজত্ব রয়েছে। তবে এ রাজত্ব আল্লাহর রাজত্বের মতো নয়। সেটা অসম্পূর্ণ রাজত্ব। তা ব্যাপক রাজত্ব নয়; বরং তা একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতরে। তাই উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যায়েদের বাড়ীতে রয়েছে একমাত্র যায়েদেরই কর্তৃত্ব ও রাজত্ব। তাতে আমরের হস্তক্ষেপ করার কোনো ক্ষমতা নেই এবং বিপরীত পক্ষে আমরের বাড়ীতে যায়েদও কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তারপরও মানুষ আপন মালিকানাধীন বস্তুর ওপর আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরে থেকে তাঁর আইন-কানুন মেনেই রাজত্ব করে থাকে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অকারণে সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ۖ] [النساء: ৫]

“যে সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ স্বরূপ দান করেছেন, তা তোমরা নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিও না।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫]

মানুষের রাজত্ব ও মূলকীয়ত খুবই সীমিত। আর আল্লাহর মালিকান ও রাজত্ব সর্বব্যাপী এবং সকল বস্তুকে বেষ্টনকারী। তিনি তাঁর রাজত্বে যা ইচ্ছা, তাই করেন। তাঁর কর্মের কৈফিয়ত তলব করার মতো কেউ নেই। অথচ সকল মানুষ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৩- পরিচালনায় আল্লাহর একত্ব:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক এবং পরিচালক। তিনি সকল মাখলুকাত এবং আসমান-যমিনের সব কিছু পরিচালনা করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[الاعراف: ٥٤] ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

“সৃষ্টি করা ও আদেশ দানের মালিক একমাত্র তিনি। সৃষ্টকুলের রব আল্লাহ তা‘আলা অতীব বরকতময়।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]

আল্লাহর এ পরিচালনা সর্বব্যাপী। কোনো শক্তিই আল্লাহর পরিচালনাকে রুখে দিতে পারে না। কোনো কোনো মাখলূকের জন্যও কিছু কিছু পরিচালনার অধিকার থাকে। যেমন, মানুষ তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং কর্মচারীদের ওপর কর্তৃত্ব করে থাকে; কিন্তু এ কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট একটি সীমার ভিতরে। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হলো যে, তাওহীদে রুব্বীয়াতের অর্থ সৃষ্টি, রাজত্ব এবং পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসাবে বিশ্বাস করা।

দ্বিতীয়ত: তাওহীদুল উলুহিয়াহ

এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার নাম তাওহীদে উলুহিয়াহ। মানুষ যেভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে এবং নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে, অনুরূপ অন্য কাউকে ইবাদাতের জন্য গ্রহণ না করা। তাওহীদে উলুহিয়াতের ভিতরেই ছিল আরবের মুশরিকদের গোমরাহী। এ তাওহীদে উলুহিয়াকে কেন্দ্র করেই তাদের সাথে জিহাদ করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জান-মাল, ঘরবাড়ী ও জমি-জায়গা হরণ হালাল মনে করেছিলেন। তাদের নারী-শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছিলেন। এ প্রকার তাওহীদ দিয়েই আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন এবং সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। যদিও তাওহীদে রুব্বীয়াত এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাতও নবীদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু ছিল; কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নবীগণ তাদের স্বজাতীয় লোকদেরকে তাওহীদে উলুহিয়াত প্রতি আহ্বান জানাতেন। মানুষ যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ইবাদাতের কোনো অংশই পেশ না করে, সদাসর্বদা রাসূলগণ তাদের উম্মতদেরকে এ আদেশই দিতেন। চাই সে হোক নৈকট্যশীল ফিরিশতা, আল্লাহর প্রেরিত নবী, আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ ওলী বা অন্য কোনো মাখলুক। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি এ প্রকার তাওহীদে ত্রুটি করবে, সে কাফির মুশরিক। যদিও সে তাওহীদে রুব্বীয়াহ এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাতের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। সুতরাং কোনো মানুষ যদি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকারী, একমাত্র মালিক এবং সব কিছুর পরিচালক, কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতে যদি অন্য কাউকে শরীক করে, তবে তার এ স্বীকৃতি ও বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, একজন মানুষ তাওহীদে রুব্বীয়াতে এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাতে পূর্ণ বিশ্বাস করে; কিন্তু সে কবরের কাছে যায় এবং কবরবাসীর ইবাদাত করে কিংবা তার জন্য কুরবানী পেশ করে বা পশু জবেহ করে তাহলে সে কাফির এবং মুশরিক। মৃত্যুর পর সে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

[المائدة: ৭২]

“নিশ্চয় যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।” [সূরা আল-মায়দা, আয়াত: ৭২] কুরআনের প্রতিটি পাঠকই একথা অবগত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তাদের জান-মাল হালাল মনে করেছেন এবং তাদের নারী-শিশুকে বন্দী করেছেন ও তাদের দেশকে গণীমত হিসেবে দখল করেছেন, তারা সবাই একথা স্বীকার করত যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তারা এতে কোনো

সন্দেহ পোষণ করত না; কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অন্যেরও উপাসনা করত, তাই তারা মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং তাদের জান-মাল হরণ হালাল বিবেচিত হয়েছে।

তৃতীয়ত: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের অর্থ হলো, আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণাঙ্কিত করেছেন সে সমস্ত নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেওয়া। আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তাতে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, তার ধরণ বর্ণনা এবং কোনো রূপ উদাহরণ পেশ করা ব্যতীত আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করার মাধ্যমেই এ তাওহীদ বাস্তবায়ন হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ নিজেকে যে নামে পরিচয় দিয়েছেন বা নিজেকে যে গুণাবলীতে গুণাঙ্কিত করেছেন, তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যিক। এ সমস্ত নাম ও গুণাবলীর আসল অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে তার ওপর ঈমান আনতে হবে- কোনো প্রকার ধরণ বর্ণনা করা বা দৃষ্টান্ত পেশ করা যাবে না। এ প্রকারের তাওহীদে আহলে কিবলা তথা মুসলিমদের বিরাট একটি অংশ গোমরাহীতে পতিত হয়েছে। এক শ্রেণির লোক আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারের ক্ষেত্রে এতই বাড়াবাড়ি করেছে যে, এর কারণে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। আর এক শ্রেণির লোক মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। আর এক শ্রেণির লোক আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কাছাকাছি; কিন্তু সালাফে সালাহীনের[২] মানহাজ[৩] হলো, আল্লাহ নিজের জন্য যে নাম নির্ধারণ করেছেন এবং নিজেকে যে সবগুণে গুণাঙ্কিত করেছেন, সে সব নাম ও গুণাবলীর ওপর ঈমান আনয়ন করতে হবে।

আল্লাহর কতিপয় নামের দৃষ্টান্ত:

১) (الحي القيوم) আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম হচ্ছে, “আল হাইয়্যুল কাইয়্যুম” এ নামের ওপর ঈমান রাখা আমাদের ওপর ওয়াজিব। এ নামটি আল্লাহর একটি বিশেষ গুণেরও প্রমাণ বহন করে। তা হচ্ছে, আল্লাহর পরিপূর্ণ হায়াত। যা কোনো সময় অবর্তমান ছিলনা এবং কোনো দিন শেষও হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব। তিনি সবসময় আছেন এবং সমস্ত মাখলুকাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকবেন। তাঁর কোনো ধ্বংস বা ক্ষয় নেই।

২) আল্লাহ নিজেকে السميع (আস-সামীউ) শ্রবণকারী নামে অভিহিত করেছেন। তার ওপর ঈমান আনা আবশ্যিক। শ্রবণ করা আল্লাহর একটি গুণ। তিনি মাখলুকাতের সকল আওয়াজ শ্রবণ করেন। তা যতই গোপন ও অস্পষ্ট হোক না কেন।

আল্লাহর কতিপয় সিফাতের দৃষ্টান্ত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدُّ اللَّهُ مَغْلُوبَةً ۖ غَلَّتْ ۖ أَيُّدِيهِمْ ۖ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا ۚ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ ۖ ﴿٦٤﴾ [يَشَاءُ] ﴿٦٤﴾ [المائدة: ٦٤]

“ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে, বরং তাদের হাতই বন্ধ। তাদের উক্তির দরুন তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়েছে, বরং আল্লাহর উভয় হাত সদা উন্মুক্ত, যেকোন ইচ্ছা ব্যয় করেন।” [সূরা আল-মায়দা, আয়াত: ৬৪]

এখানে আল্লাহ তা‘আলা নিজের জন্য দু’টি হাত সাব্যস্ত করেছেন। যা দানের জন্য সদা প্রসারিত। সুতরাং আল্লাহর দু’টি হাত আছে। এর ওপর ঈমান আনতে হবে; কিন্তু আমাদের উচিত আমরা যেন অন্তরে আল্লাহর হাত কেমন হবে সে সম্পর্কে কোনো কল্পনা না করি এবং কথার মাধ্যমে যেন তার ধরণ বর্ণনা না করি ও মানুষের হাতের সাথে তুলনা না করি। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

[الشورى: ١١] ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

“কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا ۚ بِإِلَهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ﴾ [الاعراف: ৩৩]

“হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন যে, আমার রব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অন্যায় ও অসঙ্গত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) হারাম করেছেন।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩৩]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُورًا ۚ﴾ [الاسراء: ৩৬]

“যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, অন্তর ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর হাত দু’টিকে মানুষের হাতের সাথে তুলনা করল, সে আল্লাহর বাণী “কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়” একথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং আল্লাহর বাণী,

[النحل: ৭৬] ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾

“তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭৬]- এর বিরুদ্ধাচরণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলীর নির্দিষ্ট কোনো কাইফিয়ত[৪] তথা ধরণ বর্ণনা করল, সে আল্লাহর ব্যাপারে বিনা ইলমে কথা বলল এবং এমন বিষয়ের অনুসরণ করল, যে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই।

আল্লাহর সিফাতের[৫] আরেকটি উদাহরণ পেশ করব – তা হলো আল্লাহ ‘আরশের উপরে উঠা। কুরআনের সাতটি স্থানে আল্লাহ তা‘আলা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ‘আরশের উপরে উঠেছেন। প্রত্যেক স্থানেই ‘ইসতাওয়া’

(استوى) আর প্রত্যেক স্থানেই ‘আলাল আরশি’ (على العرش) “আলাল ‘আরশি” শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন।

আমরা যদি আরবী ভাষায় ইসতিওয়া শব্দটি অনুসন্ধান করতে যাই তবে দেখতে পাই যে, (استوى) শব্দটি যখনই

(على) অব্যয়ের মাধ্যমে ব্যবহার হয়েছে তখনই তার অর্থ হয়েছে ‘(الارتفاع) বা (العلو) অর্থাৎ ‘উপরে উঠা’। এটা

ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে তখন তার ব্যবহার হয় না। সুতরাং العرشُ استوى এবং এর মতো

অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা তিনি তাঁর আরশের উপর রয়েছেন বিশেষ একপ্রকার

উপরে থাকা, যা তার সৃষ্টি জগতের উপরে সাধারণভাবে উপরে থাকার চেয়ে ভিন্নতর। আর এ উপরে থাকার বিষয়টি হান আল্লাহর জন্য প্রকৃত অর্থেই সাব্যস্ত। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার জন্য যেমনভাবে উপযুক্ত, সেভাবেই তিনি ‘আরশের উপরে উঠেছেন। আল্লাহর ‘আরশের উপরে হওয়া এবং মানুষের খাট-পালং ও নৌকায় আরোহনের সাথে কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। যে আরোহনের কথা আল্লাহ তা‘আলা উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَىٰ كَبُونَ ۚ ۱۲ لِّتَسْأَلُوهُ ۖ عَلَىٰ ظُهُورِهِ ۖ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ۖ إِذَا ۖ أَسْأَلْتُمُوهُ ۖ عَلَيْهِ ۖ وَتَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ ۖ مُقْرِنِينَ ۚ ۱۳ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۚ﴾ [الزخرف: ১২, ১৩]

“তিনি তোমাদের আরোহনের জন্য সৃষ্টি করেন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু; যাতে তোমরা তার উপর আরোহণ করতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বস এবং বল, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের জন্য বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ১২-১৪]

সুতরাং মানুষের কোনো জিনিসের উপরে উঠা কোনো ক্রমেই আল্লাহর ‘আরশের উপরে হওয়ার সদৃশ হতে পারে না। কেননা আল্লাহর মতো কোনো কিছু নেই।

যে ব্যক্তি বলে যে, ‘আরশের উপরে আল্লাহর উঠার অর্থ ‘আরশের অধিকারী হয়ে যাওয়া, সে প্রকাশ্য ভুলের মাঝে রয়েছে। কেননা এটা আল্লাহর কালামকে আপন স্থান থেকে পরিবর্তন করার শামিল এবং সাহাবী এবং তাবেঈদের ইজমার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ ধরনের কথা এমন কিছু বাতিল বিষয়কে আবশ্যক করে, যা কোনো মুমিনের মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া সংগত নয়। কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ﴾ [الزخرف: ৩]

“নিশ্চয় আমরা এ কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩] আরবী ভাষায় ইসতাওয়া শব্দের অর্থ ‘উপরে ওঠা’ এবং ‘বিরাজমান থাকা’। আর এটাই হলো ইসতিওয়া শব্দের আসল অর্থ। সুতরাং ‘তিনি আরশের উপরে উঠেছেন’ এর অর্থ, তিনি আরশের উপর উঠেছেন, বিশেষ প্রকার উপরে উঠা, আল্লাহর বড়ত্বের শানে ‘আরশের উপর যেভাবে উপরে উঠা’ প্রযোজ্য, সেভাবেই তিনি উপরে উঠেছেন। যদি ইসতিওয়ার (উপরে উঠার) অর্থ ইসতাওয়া (অধিকারী) হওয়ার মাধ্যমে করা হয়, তবে তা হবে আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করার শামিল। আর যে ব্যক্তি এরূপ করল, সে কুরআনের ভাষা যে অর্থের উপর প্রমাণ বহণ করে (তা হচ্ছে, উপরে উঠা), তা অস্বীকার করল এবং অন্য একটি বাতিল অর্থ সাব্যস্ত করল।

তাছাড়া “ইসতিওয়া” এর যে অর্থ আমরা বর্ণনা করলাম, তার ওপর সালাফে সালাহীন ঐকমত্য (ইজমা) পোষণ করেছেন। কারণ, উক্ত অর্থের বিপরীত অর্থ তাদের থেকে বর্ণিত হয় নি। কুরআন এবং সুন্নাতে যদি এমন কোনো শব্দ আসে সালাফে সালাহীন থেকে যার প্রকাশ্য অর্থ বিরোধী কোনো ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো উক্ত শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থের ওপর অবশিষ্ট রাখতে হবে এবং তার মর্মার্থের উপর ঈমান রাখতে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সালাফে সালাহীন থেকে কি এমন কোনো কথা বর্ণিত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, “ইসতাওয়া” অর্থ “আলা” (‘আরশের উপরে উঠেছেন)? উত্তরে আমরা বলব হ্যাঁ, অবশ্যই তা বর্ণিত হয়েছে। যদি

একথা ধরে নেওয়া হয় যে, তাদের থেকে এ তাফসীর স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নি, তাহলেও এ সব ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীনের মানহাজ (নীতি) হলো, কুরআন এবং সুন্নাহর শব্দ যে অর্থ নির্দেশ করবে, আরবী ভাষার দাবী অনুযায়ী শব্দের সে অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

‘ইসতিওয়া’র অর্থ ইসতাওলা দ্বারা করা হলে যে সব সমস্যা দেখা দেয়

১) ‘ইসতাওলা’ অর্থ কোনো বস্তুর মালিকানা হাসিল করা বা কোনো কিছুর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাই ‘ইসতিওয়া’র অর্থ ইসতাওলার মাধ্যমে করা হলে অর্থ দাঁড়ায়, আকাশ-জমিন সৃষ্টির আগে আল্লাহ ‘আরশের মালিক ছিলেন না, পরে মালিক হয়েছেন। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ ۖ ضَٰلٌّ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ ۚ﴾ [الاعراف: ৫৩]

“নিশ্চয় তোমাদের রব হলেন সেই আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ‘আরশের উপরে ‘ইস্তেওয়া’ করলেন।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪] তখন তাদের কথা অনুসারে অর্থ দাঁড়াবে, আসমান সৃষ্টির পূর্বে এবং আসমান যমীন সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি আরশের অধিকারী ছিলেন না। (নাউযুবিল্লাহ)

২) “আর-রাহমানু আলাল ‘আরশিস তাওয়া” অর্থ যদি ‘ইস্তাওলা’র মাধ্যমে করা শুদ্ধ হয় তাহলে এ কথা বলাও শুদ্ধ হতে হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা যমীনের কর্তৃত্ববান হলেন, তিনি তার সৃষ্টিকুলের যে কোনো কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল হলেন। অথচ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটা একটি বাতিল অর্থ। এ ধরনের অর্থ মহান আল্লাহর শানে শোভনীয় নয়।[৬]

৩) এটি আল্লাহর কালামকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার শামিল।

৪) এ ধরনের অর্থ করা সালাফে সালাহীনের ইজমার পরিপন্থী। তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে সারকথা এই যে, আল্লাহ নিজের জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, কোনো পরিবর্তন, বাতিল বা ধরণ-গঠন কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই তার প্রকৃত অর্থের ওপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের ওপর ওয়াজিব।

ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু‘।

[2] এ কিতাবের যেখানেই “সালাফে সালাহীন” বা শুধু “সালাফ” কথাটি উল্লেখ হবে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সাহাবী, তাবৈঈ এবং তাবৈঈগণ।

[3] মানহাজ বলতে আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সালাফে সালাহীনের গৃহীত নির্ভেজাল নীতিকে বুঝানো হয়েছে।

[4] আল্লাহর গুণাবলীর বিশেষ কোনো ধরণ, গঠন বা পদ্ধতি বর্ণনা করাকে “তাকরীফ” বা “কাইফিয়াত” বলা হয়। যেমন, কেউ বলল ‘আল্লাহর হাত এরকম এ রকম’ এভাবে আল্লাহর সিফাতসমূহের কাইফিয়াত (ধরণ-গঠন) বর্ণনা করা হারাম।

[5] আল্লাহর গুণাবলী এবং আল্লাহর কর্মসমূহকে আল্লাহর সিফাত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

* আল্লাহ তা‘আলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সকল বস্তুর তিনি একমাত্র মালিক। সূচনা থেকেই সকল বস্তুর ওপর তাঁর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং সকল বস্তু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ এবং তাঁর মালিকানা বহাল থাকবে। আল্লাহর ক্ষেত্রে এমন বিশ্বাস পোষণ করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ পূর্বে অমুক বস্তুর মালিক ছিলেন না। পরে মালিক হয়ে গেলেন। এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করা হলে, আল্লাহ যে মহান ক্ষমতাবান তাতে বিশ্বাস পরিপূর্ণ হবে না এবং মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=504>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন